ধর্ম-সংস্কৃতিতে সম্মোহনের পথ

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পর্ব

সৃষ্টির দিন থেকে আজ পর্যন্ত মানব সভ্যতার এই যাত্রাপথে সম্মোহন প্রতিদিনকারই সঙ্গী। এই যে সংস্কৃতি, কৃষ্টি লোকাচার, ধর্ম সম্প্রদায়ের আচার বৈশিষ্ট্য, এই সঙ্গীত শিল্পকলা, জাত্যভিমান, সাম্প্রদায়িকতা, দেশাত্মবোধ, আন্তর্জাতিকতা, এই মহাযুদ্ধ, আবার যুদ্ধোত্তর শান্তি আন্দোলন, দেশের মুক্তি সংগ্রাম এসবের মধ্যে দিয়েই সম্মোহনের পথ চলে এসেছে মনের চিরসঙ্গী হয়ে। নইলে সভ্যতা আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছত না। শুনতে আশর্চ্য লাগতে পারে বা মনে হতে পারে এ বড্ড বেশি অতিরঞ্জন হয়ে যাচ্ছে নাকি!

আসলে কে বলে দেবে আমাদের, জাদুকরের সম্মোহন সব ,সময় সম্মোহন নয়, কোন ভৌতিক মূর্তি বা কোন অজগরের তীক্ষন শীতল দৃষ্টিই শুধু আমাদের সম্মোহিত করে না । সম্মোহন আংশিকভাবে প্রতিদিন আমরাও করি এবং নিজেরাও সম্মোহিত নিজের বা অন্য কারোর কাছে। নিজেদের কাজে, চিন্তা-ভাবনায়, আচার-আচরণে, আবেগ প্রকাশে, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে, নিজের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্মোহনের প্রয়োগ ঘটে চলে প্রতিদিন। সম্মোহনের বিজ্ঞানটির ওপর যদি আলতোভাবে একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যা, তাহলে দংড়ায়- বস্তুরাজ্য থেকে প্রতিনিয়ত আগত যে উদ্দীপনা রাশি, আমাদের মস্তিষ্কের তাকে প্রাধান্যের তারতম্য-সহ গহণ এবং বর্জনের মাধ্যমে বস্তুজগতের সঙ্গে চেতনার এক সতত চলমান সম্পর্ক গড়ে চলেছে। যে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে যত তীব্র ও ব্যাপক উত্তেজনা অঞ্চল গড়ে তোলে, সেই উদ্দীপনার অনুষঙ্গে ধারণা উপলব্ধি মস্তিষ্কে তত বেশি গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ সেই ধারণা-উপলব্ধি দ্বারা মন তত বেশি প্রভাবিত বা চালিত হয়। তার বিরোধী বা তার বাইরের অন্যান্য আবেগ-উপলব্ধিকে মস্তিষ্কে মৃদু উত্তেজনায় অথবা একেবারে নিস্তেজনার আড়ালে চলেযেতে হয়। মৃদু উত্তেজনা অঞ্চল নিয়ে জেগে থাকা বিরোধী বা অন্যান্যধারণা, চিন্তা, বিচার-বিবেচনা চালক বা প্রধান উপলব্ধির সঙ্গে দ্বন্দ্ব জাগিয়ে রাখে, ফলে প্রধান উপলব্ধিকে অন্ধভাবে ধাবিত হতে বাধা দেয়, কিন্তু চেতনার চালক উপলব্ধি বা অনুভূতি যখন তীব্রতায় অথবা পুরাবৃত্তিতে তীব্র হয়ে সংলগ্ন অঞ্চলের মৃদু উত্তেজনাকেও ঠেলে নিস্তেজনায়পায়িয়ে দেয়, তখন আমরা অন্যান্য বিচার-বিবেচনা ও দ্বন্দকে অবশ করে দিয়ে বর্তমান উপলব্ধি বা আবেগের অনুসারী হয়ে পড়ি দ্বিধাহীনভাবে। দৈনন্দিন জীবনে এমন প্রায়শই ঘটে থাকে। নইলে মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দে দিশেহারা হয়ে একই বিন্দুতে স্থির হয়ে দংড়িয়ে যেত। আর তাই এ কথা বলা যায়, আংশিক বা আঞ্চলিক সম্মোহন প্রায়শই ঘচেট মস্তিষ্কে। কারণ সম্মোহন তাকেই বলি যখন কোন চেতনা, উপলব্ধি, ত ধারণা বা আবেগের অন্ধ অনুগামী হয়ে পড়ে, সংলগ্ন বা প্রাসঙ্গিক অন্যান্য উপলব্ধি মস্তিষ্কে নিস্তেজার ঘুমের মদ্যে চলে যায়। দৈনন্দিন সম্মোহন প্রক্রিয়াগুলো সাধারণত আঞ্চলিক বা আংশিক, কারণ সামগ্রিকভাবে মস্তিষ্কে জাগ্রত অবস্তা বজায় থাকে। সার্বিক বা সম্মোহন তখনই হয় যখন নির্দিষ্ট আবেগ-উপলব্ধি ত্বারা এতটা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালতি হয়ে পড়ি ে আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিচার বিবেচনা থেকেসম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ পরিবেশ নিরপেক্ষ হয়ে পড়ি - এই অবস্থায় সম্মোহনের অঞ্চলটি বাদে মস্তিষ্কের সমগ্র অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক নিস্তেজনা বা ঘুম, যেমন ঘটে ভর ওঠা , বাব সমাধি, হিস্টিরিয়ার ফিট, চিকিৎসার সম্মোহন ইত্যাদিতে। আংশিক সম্মোহনের জোরালো উদাহরণ । হঠাৎ আবেগপ্রবণ বা ইম্পালসিভ আচরণ , রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতার বক্তৃতায় অভিভূত হয়ে যাওয়া, নাটকের দৃশ্যে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া, গভীর মনোযোগে কেনও একটি গান শুতে শুতে অতীতচারী হয়ে পড়া ইত্যাদি। রামধনুর বর্ণলীতে লাল আর কলমা রঙের সীমারেখা যেমন কোনদিনই নির্দিষ্ট করা যায় না, ঠিক কোন্ জায়গায় কমলা রঙ শুরু হল, এ যেমন অনির্দিষ্ট,তেমনি কখন থেকে সম্মোহন শুরু হয়ে যায়, অর্থাৎ কখন প্রধান উপলব্ধি আর ক সকলের প্রভাব কাটিয়ে ওঠে তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আংশিক সম্মোহিত আচরণ আর সচেতন সম্মোহনমুক্ত আচরণের মিলিত ছবি। প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে সম্মোহনের প্রভাব বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে ধর্ম ও সংস্কৃতির আচরণের মধ্যে।

'' খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গী এল দেশে''- লোকগাথার এই সুর আর ছন্দ্রে দুলুনিতে আমরা ঘুমিয়ে পড়েছি কতবার। সঙ্গীতের সুর আর ছন্দ মনের মধ্যে দ্রুত সম্মোহন বিস্তারে সক্ষম। সুর তার ধবনির বৈচিত্য দিয়ে, তার মেলোডি আর হারমোনি দিয়ে মস্তিষ্কে যে মনোরম উত্তেজনা তৈরি করে, ছন্দের দুলুনিতে দুলেদুলে সেই উত্তেজনা আরও তীব্র ও ঘনীভূত হয়েওঠে, আর চারপাশের অন্যান্য উত্তেজনা, মনের নানা বিক্ষেপগুলো সরে যেতে যেতে ক্রমশ বাকি মস্তিষ্কে ঘুম নেমে আসে। সুরের বাইরের জগৎ যেন অস্তে চলে যায় আর সুর ভাষার মাধ্যমে যে জগৎকে বহন করে আনে, কখন চারপাশের জগৎ যেন অস্তে চলে যায় আর সুর ভাষার মাধ্যমে যে জগৎকে বহন করে আনে, কখন চারপাশের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেই জগতে ধরা পড়ে যাই। তাই নানা লোকগাথা, লক্ষ্মীর পাঁচালী, ভাদু-টুসু গানের সুর আর ছন্দ্রে ভেতর এসে দংড়াতে চেয়েছে আমাদের জাতির আর সম্প্রদায়ের অপূর্ণ বাসনা, আকুলতা, ইচ্ছা, আকাঙক্ষা। '' বুলবুলিতে ধান খেয়েছে ঝখাজনা দেব কিসে'' -- শুধু এর ছন্দই যে আমাদের ঘুম পাড়িয়েছে তা বোধহয় নয়, হয়তো এর ভাষা দিয়ে তৈরি যে চিত্রকল্প, তার পুনরাবৃত্তিতে, এর কথার ভেতরে সুদূর কালের প্রবাহ যে অনুভূতি বয়ে এনেছে। শিশু আর মায়েদের মধ্যে সেও তৈরি করেছে এক মগ্নতা। খাজনা দিতে না পারার নিরুপায়তা জীবনের আর সব দুঃখের প্রতিনিধিত্ব করেছে। গানের দুঃখ প্রকাশের মদ্যে দিয়ে নানা দুঃখের প্রশমন হয়েছে লোক গাথার ছন্দে ছন্দে। দুঃখ প্রশমনের তৃপ্তি ছন্দোবদ্ধবাবে চতলতে চলতে মস্তিষ্কে শান্তির সম্মোহন গড়ে তুলেছে। শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে মাকেও আমরা ঘুমিয়ে পড়তে দেখেছি কতবার।

পৃথিবীর সব দেশে লোক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গ্রাম সভ্যতা থেকে স্বতঃ উৎসারিত হয়ে, মাটির কাছের জীবন থেকে, তার শ্রম থেকে, তার নৈন্দিৱন দুঃখ কষ্ট, আনন্দ আর অসহায়তা থেকে। মানুষের দুঃখ যুগে যুগে দুঃখের সম্মিলিত রূপ হতে চেয়েছে। ব্যক্তির অসহায়তা সমবেত হয়ে অসহায়তার কোরাস হতে চেয়েছে। তাই নানা ব্র-আচার বা রিচ্যুয়ালে (যেমন ইতুপুজো, শিবরাত্রি, নীলষষ্ঠী) নানা আচার-পার্বণে (যেমন নবান্ন, ভাদু, টুসু) মেয়েদের একক দুঃখ উৎসবে সম্মিলিত রূপ নিতে চেয়ে। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের পরাধীনতা-জনিত অসহায়তা, নিরুপায়তা তেকে মেয়েদের নানা ব্রত জন্ম নিয়েছে। মূলত নিরাপত্তার অভাব থেকেই যে ব্রতের প্রচলন, তা এইসব ব্রতের ভেতর দিয়ে যে লোক -কাহিনী বা মিথগুলি প্রবাহিত সেগুলি তেকেই প্রমাণিত হয়ে যায়।

ইতুপূজোর ব্রত-তে অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতুদেবীর পূজো করে মাসের ংক্রান্তিতে এসে নদী বা পুবকুরে ইতু বিসর্জন দেওয়া। ইতু দেবী সন্তুষ্ট হলে যথার্থ সুখ-সম্পদের অধিকারিণী হ্যয়া যায়। নীলষষ্ঠীর ব্রতে চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে মায়েরা সারাদিন নীলের উপোস করে সন্ধের সময় শিবের মাথায় জল ঢাললে সন্তানের মঙ্গল হয়। শিবরাত্রির ব্রত তে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দশীতে মেয়েদের সারাদিন উপোসের পর গঙামাটি দিয়ে শিবলিঙ্গ তৈরি করেসারারাত জেগে চার প্রহরে চারবার শিবপূজোর শেষে সকালে শিবের মমাথায় জল ঢাললে ধর্ম,অর্থ, কাম মোক্ষ তথা শিবের মত স্বামী লাভ হয়।

আচার -পার্বণের মদ্যে বিখ্যাত ভাদু ও টুসু গানকে ভিত্তি করে ভাদু ও টুসু পরব বাংলায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া দক্ষিণ বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান অঞ্চলে প্রধানত কুমারী মেয়েরাই শ্রাবণ -সংক্রান্তি থেকে ভাদ্র-সংক্রান্তি সারা ভাদ্রমাস রাজকন্য ভাদুকে কেন্দ্র করেতাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করে এই গান গায়। ভাদু দেবীকে সমবেতভাবে ঘিরে আবাহন গান করে ও পূজো করে। ভাদ্র সংক্রান্তিতে মেয়েরা সমবেত ভাদুগান গেয়ে রাত জাগে। এইসব গানের মদ্যে মেয়েরা নিজেদেরমনের কথা, এমনকি অনেক অবরুদ্ধ যন্ত্রণাও প্রকাশ করে ফেলে। অন্যদিকে টুসুগান প্রধানত শস্যোৎসবের গান। আচার-ক্রিয়ায় নবান্নের সঙ্গে এর অনেক মিল এবং এটিও সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের আচার-পার্বণ। গৃহস্ত শুদ্ধবস্ত্র পরিদান করে ধানের আড়াই মুঠো গুচ্ছকেটে দান গাছের মূল থেকে সঞ্চিত জল ঘটে ভ'রে উলু-শঙ্খধবনি দিয়ে জমি থেকে বেদীতে বা আসনে রাখা হয়। সেই হল টুক দেবী । ধানের চাল দিয়ে নবান্ন হয় আর তুষ হয়ে ওঠে টুসুর প্রতীক। বাদুর মত টুসুতেও গানে জাগরণে পূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত করে মেয়েরা। প্রভাতে 'টুসু' প্রতিমাকে বিসর্জন দেওয়া হয়।

মিথ-রিচুয়্যাল তত্ত্বে মনে করা হয় সমস্ত মিথই হল প্রাচীন আচার-সমূহের আখ্যান। এমনকি ইতিকতা বা অন্যান্য লোককথাওমিথের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সমস্ত ঐতিহ্যমূলক কথা, আচার, ধর্মীয় নীত, প্রথা- এমনকি যাদু ক্রিয়া, ছেলে ভুলানো ছড়া, ক্রীড়া সমূহ ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি উপাদানই প্রাচীন ক্রিয়াচারের মধ্যে থেকেই জন্মলাভ করেছে বলে মনে করা হয়। আচার ক্রিয়া বা রিচুয়াল সংশ্লিষ্ট মিথগুলি পৃথিবীর বহুদেশেই দেখা যায় আত্মপীড়ন বা বলিদান জাতীয় ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। মেয়েদের ব্রতকথায় ইতুপূজোয় উমনো - ঝুমনো দুই মেয়ে র সম্পত্তিলাভের গল্প। নীলষষ্ঠীতে বামন-বামনীর শস্তার মৃত্যুর গল্প, ভাদু উৎসবে রাজকন্যা বাদুর গল্প, টুসুর লোককাহিনীর এই মিথগুলিতে যুগযুগান্তের নারীর অসহায়তাই উঁকি দেয়। সাধারণ মানুষের কাছে মিথগুলি লোকমুখে দূর কালের প্রবাহ বেয়ে আসার ফলে মনোরাজ্যে সম্মোহন-অঞ্চল সৃষ্টি করে প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠে।) তাই এইসব মিথ ও রিচুয়্যালগুলি যুগের সম্মোহন, জাতির সম্মোহন। মিথের সম্মোহন অঞ্চলকে আচার প্রক্রিয়া আর অনুষ্ঠানগুলি আরও সীমায়িত করের সুস্থিত করে। ভাদু, টুসু উৎসবের নানা আচার ও আনুষ্ঠানিকতা মনকে চারপাশের বেক্ষেপ থেকে বাস্তবের নানা প্রশ্ন তেকে সরিয়ে একটি সীমানার মদ্যে এনে বেঁধে ফেলে। সেই সীমানার বাইরের মনোরাজ্যের নিস্তেজনায় ডুবে যায় বাস্তবের প্রশ্ন। পলে উৎসবের অনুষ্ঠান যতই এগোতে থাকে আচার ও সমবেত সঙ্গ ীতের মদ্যে দিয়ে ততই মিথগুলির কাল্পনিকতা ও জাদুমূলক উপাখ্যান সীমায়িত সম্মোহন অঞ্চলের মদ্যে উপলব্ধির জগতে সত্য হয়ে উঠতে থাকে। ভাদু রাজকন্যার সঙ্গে একাত্মতার কাল্পনিক অনুভূতি মিথের অন্তর্গত জাদুমূলক উপাখ্যানের মাধ্যমে অসহায়তা তেকে কাল্পনিক সংকটমোটনের স্বস্তি উপলব্ধির জগতে সত্য হয়ে উঠতে থাকে। মনোরোগের ক্ষেত্রে অবশেসান যেমন একটি আঞ্চলিক সম্মোহিত অবস্থা। আচার বা রিচুয়ালগুলিও, ‘‘এটা করতে নেই, ওটা করতে হয়’’- এইসব নিয়মগুলি যুগ যুগ ধরে মনের মদ্যে পুরাহবৃত্ত হতে হতে শেকড়চারিয়ে গিয়ে প্রশ্নাতীত হয়ে ওঠায় চারপাশে কোন প্রশ্ন আর বিরোধী উত্তেজনা অঞ্চল তৈরি করতে পারে না। ফলে রিচুয়্যালগুলি যে আঞ্চলিক সম্মোহন ক্ষেত্র তৈরি করে ফেলে, তার কেন্দ্রে উৎসবের মূল অনুভূতিটি অর্থাৎ মেয়েদের অসহায়তা, আর্তি আর নিরাপত্তার আশ্বাস মিথের কাল্পনিকতার ভেতর প্রতীকী আশ্রয় নেওয়া, সমবেত গানের মদ্যে ব্যক্তির আর্তি প্রশমিত হবার প্রক্রিয়াটি সুরক্ষিত হয়ে ওঠে। ভাদু উৎসবের ভাদ্র সংক্রান্তিতে সমবেত ভাদুগান-সহ রাত্রি জাগরণে একক অবরুদ্ধ ব্যথাসমষ্টিগত স্বীকৃতি পেয়ে প্রশমিত হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানে যাকে বলি অ্যাবরিঅ্যাকশন (ট্রক্সন্দ্রত্তব্ধনস্ক্সগ্ন এসব গানের মধ্যে মেয়েরা নিজেদেরই নানা সান্ত্বনা দেয়, সঙ্গীতের ছন্দোবদ্ধ পুনরাত্তিতে যা আংশিক সম্মোহিত অবস্থায় স্ব-অভিবাবনের ছট্রত্তব্ধস্বন্দত্তন্ধন্দব্দব্ধনস্ক্সগ্ন এসব গানের মধ্যে মেয়েরা নিজেদেরই নানা সান্ত্বনা দেয়, সঙ্গীতের ছন্দোবদ্ধ পুনরাত্তিতে যা আংশিক সম্মোহিত অবস্থায় স্ব-অভিবাবনের (কাজ করে তীব্রভাবে । কাজ করে তীব্রভাবে । এক একটি প্রশ্নাতীত সম্মোহন অঞ্চল প্রজন্ম তেকে প্রজন্মান্তরে বয়ে নিয়ে যায়। উৎসবের অনুষ্ঠানগুলি প্রাত্যহিকতার অতিবাস্তব প্রশ্ন থেকে আমাদের ছিন্ন করে মিথের সম্মোহন অঞ্চলে ডুবিয়ে দেয়। সেই অঞ্চলে কাল্পনিক সুখে মগ্ন হয়ে দুঃখের প্রশমন ঘটে, বাস্তবের জীবনে আবার নতুন প্রাণ নিয়ে ফিরে আসি। ঠিক যেমন দুর্গাপূজোয় দশমীতে পার্বতীর বিদায়ে সধবা মেয়েরা সিঁদুর পরিয়ে নিজেদের সধবাত্বের গর্ব আর বাপের বাড়ি ত্যাগের যন্ত্রণার অ্যাবরিঅ্যাকশন ঘটায়। ভাদু রাজকন্যাকে ঘরের মেয়ের মত নামে ডেকে রাজকন্যাকে ঘরের মেয়ে করে নিয়ে রাজকন্যার মত ভাগ্যবতী হবার প্রতীকী ইচ্ছাপূরণ, ভাদু ও টুসু দেবীকে ডাক নামে ডেকে অলৌকিক জাদুশক্তি-সম্পন্ন দেবীকে ঘরের মেয়ের মত সহজ করে নিয়ে। তার কাছে নানা কামনা-বাসনার আর্জি রাখতে পারা এসব কাল্পনিক অলীক ইচ্ছাপূরণ সম্ভব হয় সমবেত অনুষ্ঠান সৃষ্ট সম্মোহনী আবহ তৈরী হবার ফলে। কাল্পনিক সুখানুভূতিকে তখন বাস্তব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হতে হয় না।

আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি, যুগ যুগ ধরে লোকাচারে, লোক-পার্বণে মাটির থেকে উঠে আসা দুঃখ-আনন্দ, ব্যথা, কাতরতা উঁকি দিয়েছে বারে বারে, বারে বারে সমষ্টির সমবেত দুঃখের তালে আর ছন্দে মিলে যেতে চেয়েছে, একক নিরাপত্তাহীনতাকে সমবেত অসহায়তার মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে জাতি বা গোষ্ঠীর সহেগ একাত্মতায় নিরাপদ আশ্রয় চেয়েছে। প্রজাতির মধ্যে নিজের মুক্তি খুঁজছে। দুঃখ যখন সকলের হয়ে ওঠে দুঃখ তখন আর দুঃখ থাকে না, উৎসবের মধ্যে নিজের দুঃখের আরতি সম্ভব হয়েছে। দুঃখে সমবেত তান মনে সম্মোহনের তরঙ্গ তৈরির করতে পারে বলেই উৎসবের দিনে ব্যক্তিগত দুঃখের গ্লানি ভেসে দুঃখ সার্বজনীন হয়ে ওঠে, দুঃখৰ তখন অহঙ্কার হয়ে ওঠে।

ধর্মের উৎপত্তি নিয়ে নানা বিতর্ক থাকল্যে এ মহাবিশ্বে মানুষের অনিত্যতা, এই অসীম অনন্তের মদ্যে মানুষের অসহায়তা, বিস্ময় এবং অমোঘ মৃত্যুকে অতিক্রম করেঅমর হবার আর্তি থেকে, শাশ্বতের সঙ্গে যুক্ত হবার আকুলতা থেকে সীমাহীনের প্রতি আত্মসমর্পণের প্রয়োজন এসে গেছে যুগে যুগে। এইসব আতিত আর াকুলতানানা প্রাচীন প্রথা, আচার, তন্ত্র, সাধনার মধ্যে দিয়ে প্রশমিত হ’ত ধর্ম সৃষ্টির আগে। লোকসংস্কৃতির মধ্য মিশে থাকা দর্শনের সঙ্গে যুগের আরও কিছু তৈতিহাসিকতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্ম নেয় পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম। ধর্ম সৃষ্টির যুগে তখনকার বিশেষ শ্রেণীর কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের উপাদান মিশে যায় ধর্মের নীতি অ আদশেতর মদ্যে । অতিনির্দিষ্ট নীতি ও দর্শনকে ঘোষণা করা হয় চিরসত্য ও অপরিবর্তনীয় ঈশ্বরের বাণী হিসাবে। মৃত্যুভয়ে ভীত মানুষ সমস্ত দ্বন্দাব- সংকটের ভার অলৌকিক ক্ষমতা-সম্পন্ন ঈশ্বরের হাতে তুলে দিয়ে মুক্ত হয়ে ধর্মের ছাতার নিচে জড়ো হতে থাকে। জন্মান্তরের আশ্বাস, হ্যামলিনের বাঁশির মত মানুষকে সম্মোহিত করে। ধর্মের নিদিতষ্ট দর্শনের দাসত্বের ফলে মুক্ত চিন্তা অবরূদ্ধ হয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন পোপ, ইমাম, পুরোহিতের আধিপত্য সুরক্ষিত হয়। এইভাবে নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানিকতায় এসে ইতিহাসের বুকে ধর্ম এক স্থির অচলায়তনে পরিণত হয়, কোরান হাদীস এর কথা ইসলামী জনগণকে চিরসত্য, অপরিবর্তনীয় , ফলে এই সেদিনও মাত্র ক’বছর আগে যখন পৃথিবীর সমস্ত শিশুরা তাদের ভূগোল বই-ও পড়ত পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে, তখনও ভ্যাটিকান সিটি মনে করতো ঠিক তার উল্টো, ধর্মের এমনই সম্মোহনী শক্তি। হিন্দুধর্মে মায়াবাদের প্রধানতম প্রচারক শঙ্করাচার্য তাঁর শারীরিক ভাষ্য-র ভূমিকাতেই ঘোষণা করেছেন ‘‘ সর্ব প্রকার প্রমাণ প্রমেয়, ব্যবহার অবিদ্যা বা অজ্ঞানমিশ্রিত’’ অর্থাৎ সব রকম প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিথ্যা, অতএব জগৎ মিথ্যা মায়া বা অজ্ঞানের ফলেই এই মিথ্যা জগৎ পরিকল্পিত হয়, চিন্ময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সব ধর্মেই দেখা যাচ্ছে, অতি নির্দিষ্ট দার্শনিক নীতির লক্ষ্মণ -রেকা টেনে স্বাধীন চিন্তার পথকে অবরোধ করা হয়েছে। সমস্ত দ্বান্দ্বিক চিন্তার ক্ষেত্রকে বন্ধকরবার জন্য চেতনাকে জন্মান্তরবাদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয় া হয়েছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পোপ, ইমাম,পুরোহিত চায়নি মুক্ত চিন্তা। ধর্মের অতি নির্দিষ্ট দর্শন নিদিতষ্ট কিছু শব্দের ধবনিকে পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে আর মনোজগতে পরলোকে অমরত্বের স্বপ্নাবেশ তৈরি করে সম্মোহিত করে রেখেচে। গোষ্ঠী চেতনাকে ব্যবহার করা হয়েছে ধর্মকে টিকিয়ে রাকতে । কোরান,বাইবেল বা বেদ-এর কথা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নেয়,এমন মা ুষের সংখ্যা দুর্লভ হয়েও শুধুমাত্র হিন্দু, খ্রিস্টান বা মুসলিম শব্দে সাড়া দিয়ে ওঠে এমন মাুষ পৃথিবীতে অধিকাংশ। তাইবোঝা যায়, শুধুমাত্র যে নির্দিষ্ট একটি শব্দ অসংখ্য মানুষের মস্তিষ্কে সম্মোহনের অনড় অঞ্চল তৈরি করে ফেলেছে, আমরা গোষ্ঠী নিরাপত্তার প্রস্নে সমাজে গণসম্মোহন ঘটে যায়। ধর্মে ধর্মে, দাঙ্গা বাধিয়ে দিই। এক কিটে দাঙ্গা মানু,কের নতুন করে সম্মোহিত করে, সাম্প্রদায়িক করে তোলে। গোষ্ঠী নিরাপত্তাহীনতা মানুষের অস্তিত্বের প্রাথমিক শর্তকেই বিপন্ন করে তোলে। তাই নিরাপত্তার প্রশ্নে গোষ্ঠী বা সাম্প্রদায়িক চেতনায় অন্ধ হয়ে পড়ে মন। অন্যান্য যুক্তি বিবেচনা সম্মোহিত মস্তিষ্কে প্রবেশ করতে পারে না। গণসম্মোহন ঘটে গেলে দাঙ্গারর আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। যুগ যুগ ধরে মানুষের উত্তরোত্তর চেতনার বিকাশের পথে ধর্ম ক্রমশ এক অচল সংস্কারে পরিণত হচ্ছে। রাজনৈতিক স্বার্থে তার সংস্কারকে ব্যবহার করে তাকে টিকিয়ে রাখা হচ্ছে । আধুনিক মানবিক ধর্মেরধারা তাই তৈরি হতে পারছে না।

ধর্মের তুলনায় লোকায়ত দর্শন অনেক বেশি মাটির তেকে উঠে আসা, আচার-ক্রিয়া ভিত্তিক। ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী তার দর্শন, জন্মান্তরে বিশ্বসী নয়, শরীরই শেষ কথা। তন্ত্রে বলছে ‘‘ যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাই আছে দেহবাণ্ডে’’। লোকায়ত দর্শন ছড়িয়ে আছে তন্ত্র, বাউল বৈষ্ণব, সহজিয়া সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট আচার-প্রক্রিয়া,বিস্বাস সাধনা, সম্মোহন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সীমানা টিকিয়ে রাখে,তবু লোকাচার ভিত্তিক হওয়ায় সমাজ জীবনের স্রোতে এর বিবর্তন ঘটেছে। ধর্মের মত অচলায়তন হয়ে মানুষকে পেছন তেকে অতখানি টেনে রাখেনি। দ্বিতীয় পর্বে এ নিয়ে বিস্তারিত লেখা যাবে ।